উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে রামেশ্বরম পর্যন্ত দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সম্ভবত দক্ষিণে তিনি পাণ্ড্য রাজা শ্রীমর শ্রীবল্লভকে পরাস্ত করেছিলেন। উত্তর ভারতে তিনি আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটরা তাঁর সাম্রাজ্যের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। পিতার মতো দেবপাল বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব তাঁর কাছে দূত পাঠিয়ে নালন্দায় একটি বিহারের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপাল এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

ধর্মপাল ও দেবপালের নেতৃত্বে পাল সাম্রাজ্য ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছিল। আরব বণিক সুলেমান পাল সাম্রাজ্যের পরিচয় রেখে গেছেন। ৮৫১ খ্রিস্টাব্দে সুলেমান লিখছেন যে, পালদের রাজ্য (রুমি) পার্শ্ববর্তী গুর্জর ও রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল তবে পালরাজার সৈন্যবাহিনী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে আয়তনে বড় ছিল। পাল রাজা যুদ্ধে ৫০,০০০ রণহস্তী ব্যবহার করতেন, দশ থেকে পনেরো হাজার লোক তাঁর সৈন্যবাহিনীর সেবার কাজ করত। তারানাথ পাল রাজাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের কথা উল্লেখ করেছেন। ধর্মপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০০টি গ্রাম দান করেন। তিব্বতের সঙ্গে পাল রাজাদের যোগাযোগ ছিল, বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিব্বত থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নালন্দায় শিক্ষালাভের জন্য আসতেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে পাল রাজাদের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এই বাণিজ্য থেকে পাল সাম্রাজ্য লাভবান হয়েছিল। নবম শতকের মধ্যভাগে পাল সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। কলচুরি ও চান্দেল্লদের আক্রমণ ছিল এর একটি কারণ। প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮) পাল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারে মন দেন। ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে দিব্যর নেতৃত্বে কৈবর্তরা বিদ্রোহ করে উত্তরবঙ্গে ক্ষমতা দখল করেছিল। দিব্য, তাঁর ভ্রাতা রুদক ও ভীম তিন প্রজন্মকাল ধরে বরেন্দ্রী শাসন করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এ এই বিদ্রোহের বর্ণনা আছে। পালরাজা রামপাল এই বিদ্রোহ দমন করে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্য টিকে ছিল।

পাল রাজবংশের শাসনকালে কৈবর্ত বিদ্রোহ

পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে (১০৭০-৭১) বাংলাদেশে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন কৈবর্ত নেতা দিব্যক (দিব্য)। সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এ এই বিদ্রোহের বর্ণনা পাওয়া যায়। রামচরিত ছাড়া সমকালীন আরও তিনখানি লেখতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কামাউলি পট্টে, মদনপালের মানাহালি দানপত্রে এবং পূর্ববঙ্গের বর্মনবংশীয় ভোজবর্মনের বেলবা দানপত্রে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *রামচরিত*-এর

Scanned with CamScanner

পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করেন যে বাংলার কৈবর্তরা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে নির্যাতিত হয়েছিল (The Kaivarta community were smarting under Mahipala's oppression.) শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য হলো দিব্য মহীপালকে হত্যা করে তার স্বজাতীয়দের অপশাসন থেকে মুক্ত করেন। এমন কথাও বলা হয়েছে যে এই মহৎ কাজের জন্য জনসাধারণ তাকে রাজা নির্বাচিত করেছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী ও তার পিতা প্রজাপতি নন্দী পাল রাজাদের কর্মচারী ছিলেন। বাংলার পাল বংশের প্রতি তাদের আনুগত্য ও পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক। সেজন্য রামচরিতের বর্ণনাকে সকলে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেননি। সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যকে দস্যু ও 'উপাধিব্রতী' বলেছেন। রামচরিতে এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে দিব্য মহীপালের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। রামচরিতকারের মতে দিব্য দস্যু ছিলেন, দেশহিতের ভান করে তিনি রাজাকে হত্যা করেন। মহীপালের শাসনকালে বাংলায় এক সামন্ত বিদ্রোহ হয়েছিল (মিলিতান্তক সামন্তচক্র)। এই বিদ্রোহে দিব্য মহীপালের সঙ্গে ছিলেন, যুদ্ধে রাজা পরাস্ত হলে তিনি তাকে হত্যা করে বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গ অধিকার করে নেন।

রামচরিতে চোদ্দজন সামন্ত রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন ভীমযশ, কোটাটবীর রাজা বীরগুণ, দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ, বিক্রম, হুগলির লক্ষ্মীশূর, কুজবটীর রাজা শূরপাল, মানভূমের রাজা রুদ্রশিখর, উচ্ছালের রাজা ভাস্কর, ঢেকুরীরাজ প্রতাপসিংহ, সংকটগ্রামের রাজা চণ্ডার্জুন, কয়ংগল মণ্ডলের অধিপতি নরসিংহার্জুন, নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ, কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন এবং পদুবন্বার রাজা সোম।

এই চোদ্দজন সামন্তরাজা মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ছিল না, অমাত্যদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে তিনি যুদ্ধ করেন, পরাস্ত ও নিহত হন। এই তালিকার ওপর নির্ভর করে অধ্যাপক রামশরণ শর্মা তার সামন্ততন্ত্রের ভিত্তিকে জোরদার করেছেন। কৈবর্ত বিদ্রোহ তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উপযোগী অনেক উপকরণ সরবরাহ করেছে। তাঁর অনুগামীদের অনেকে এই বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, এই কৈবর্তরা ছিল কৃষক, কৃষকের ওপর অত্যাচার হলে সামন্তপ্রভুদের নেতৃত্বে তারা রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন রামচরিত একখানি কাব্য, ইতিহাস নহে। দিব্যর বিদ্রোহের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই। এই বিদ্রোহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আর পাঁচটি বিদ্রোহের মতো। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, রাজবংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, মহীপাল তার দুই ভ্রাতা শূরপাল ও রামপাল-কে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। সামন্তরাজারা বিদ্রোহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। দিব্য এদের নেতৃত্ব দেন, দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্রভূমি অধিকার করেন। বাংলার কৈবর্তরা বহুকাল ধরে রাজকার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। রাজ্যপালের সময় থেকে এই ধারা চলে

Scanned with CamScanner

আসছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন : 'মহীপাল যে প্রজাপীড়ক বা অত্যাচারী রাজা ছিলেন এবং এই জন্যই তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। আর এই বিদ্রোহকে কৈবর্ত জাতির বিদ্রোহ বলিয়া চিহ্নিত করাও সঙ্গত নহে। দিব্য কৈবর্ত জাতীয় ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এই জাতির উপর রাজার অত্যাচারের জন্য মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন রামচরিতে ইহার সমর্থক কোনো উক্তি বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইরূপ বিদ্রোহ সেযুগে প্রায়ই ঘটিত'।

উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে পণ্ডিত মহলে অনেক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন উত্তরবঙ্গের কৈবর্তরা ছিল জেলে, মৎস্যজীবী। অন্যমতে, এরা হলো চাষি কৈবর্ত, জেলেদের একাংশ বৃত্তি পরিবর্তন করে চাষি কৈবর্ত হয়ে যায়। অধ্যাপক বি. সি. সেন মনে করেন মৎস্যজীবী কৈবর্তদের ওপর পালরাজাদের উৎপীড়ন হলো এই বিদ্রোহের একটি কারণ। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, প্রাণীহত্যা পছন্দ করতেন না, তা নিয়ে বিরোধ। অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী এইমতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে পাল রাজারা বৌদ্ধ হলেও খুব সহিষ্ণু ছিলেন। তাছাড়া, পালযুগে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে ব্যবধান কমে এসেছিল, দুই ধর্মের মধ্যে বিরোধ ছিল না। তিনি আরো জানিয়েছেন যে পাল আমলে কৈবর্তদের ওপর অত্যাচার হয়েছিল এর কোনো প্রমাণ নেই। অক্ষয় কুমার মৈত্র বলেছেন যে পালবংশের রাজপুত্রদের মধ্যে রামপাল ছিলেন যোগ্যতম কিন্তু মহীপাল বয়সে বড় হওয়ায় সিংহাসন লাভ করেন। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়ায় এই বিদ্রোহ হয়। অধ্যাপক এ. এম. চৌধুরী এই মতও বাতিল করে দিয়ে বলেছেন যে বিদ্রোহ সফল হলে রামপাল রাজ্যের কেন্দ্রস্থল থেকে বিতাড়িত হন। রামচরিতে বলা হয়েছে যে এই বিদ্রোহ রামপালের বিশেষ মনোকষ্টের কারণ হয়েছিল। রামপালের সমর্থনে এই বিদ্রোহ হয়েছিল এর কোনো প্রমাণ নেই।

রামচরিতে এই বিদ্রোহকে অপবিত্র ধর্মবিপ্লব বলে উল্লেখ করা হয়েছে (অনিকম ধর্ম বিপ্লবম্)। ধর্মের অর্থ যদি হয় ন্যায়নীতি তবে অবশ্যই তা লঙ্ঘন করা হয়েছিল। দিব্য সামন্ত বিদ্রোহের সময় রাজার পক্ষে ছিলেন। রাজার পরাজয়ের পর তিনি বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা দখলের এই কাজকে সন্ধ্যাকর নন্দী কর্তব্যচ্যুতি বা ধর্মবিপ্লব বলে উল্লেখ করেছেন। ক্ষমতা দখল করে দিব্য তার ভ্রাতা রুদক ও রুদকের পুত্র ভীম তিন প্রজন্ম ধরে ক্ষমতা ভোগ করেন। উত্তরবঙ্গের কৈবর্তরা ছিল শক্তিশালী ও যুদ্ধপ্রিয়। দিব্যর রাজ্যের ওপর পাল ও পূর্ববঙ্গের বর্মনরাজা জাঠবর্মনের আক্রমণ হয়েছিল। তিনি এসব প্রতিহত করে নিজের ক্ষমতা বজায় রাখেন। তাঁর ভ্রাতা রুদকের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে রামচরিতে এই কৈবর্ত বংশের তৃতীয় শাসক ভীম সম্পর্কে প্রশংসাসূচক উক্তি আছে।

Scanned with CamScanner

তাঁর শক্তি ও সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে। ভীম যোগ্যশাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে, তাঁর শাসনকালে উত্তরবঙ্গের উন্নতি হয়েছিল। ভীমের দক্ষ অশ্বারোহী ও হস্তিবাহিনী ছিল। তাঁর সম্পদ কম ছিল না, তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী, ধার্মিক ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শিব ছিল তাঁর উপাস্য দেবতা। সমকালের লোককাহিনীতে তিনি বেঁচে আছেন। বগুড়ার 'ভীমের জাঙ্গাল' সম্ভবত তাঁর তৈরি ছিল। তিনি ডমর নামে একটি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। রামপালের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। রামপাল সামন্তরাজাদের অর্থ ও ভূ-সম্পত্তি দিয়ে তার দলে টেনেছিলেন। সামন্ত বিদ্রোহের ফলে মহীপাল ক্ষমতা হারিয়েছিলেন, আবার সামন্তদের সহায়তা নিয়ে রামপাল (১০৭২-১১২৬) ক্ষমতা ফিরে পান।

বরেন্দ্রভূমির কৈবর্ত বিদ্রোহ প্রমাণ করেছিল যে বাংলার সামন্ততন্ত্র রাজতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। সামন্ততন্ত্র সাময়িকভাবে জয়ী হয়েছিল। সামন্ততন্ত্র নিজেদের ঐক্য রক্ষা করতে পারেনি। রামপাল এদের একাংশের সহায়তা নিয়ে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। এই বিদ্রোহের অন্য তাৎপর্য হলো নিম্নবর্গের মানুষ সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নিম্নবর্গের মানুষদের সহায়তা নিয়ে দিব্য ক্ষমতা দখল করেন। পণ্ডিতদের অভিমত হলো তিনি কোনো কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেননি। 'দিব্য কোনো প্রজা বিদ্রোহের নায়কত্ব করেছিলেন, তার কোনো প্রমাণ নেই'। তিনি তার সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন কিনা তা নিয়েও মতভেদ আছে। সামন্ততন্ত্রের কয়েকজন তাকে সমর্থন করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি তাদের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তিনি দস্যু ছিলেন না, তার পেছনে অবশ্যই কিছু জনসমর্থন ছিল। তা না হলে তাঁর বংশ তিন প্রজন্ম ধরে ক্ষমতাভোগ করতে পারত না। তিনি অবশ্যই জনসমর্থন পেয়েছিলেন, তবে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের মতো তিনি নির্বাচিত রাজা ছিলেন না। রাজপরিবারের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব তাঁর সহায়ক হয়েছিল। একাদশ ও দ্বাদশ শতকের অন্যান্য বিদ্রোহের মতো এটি ছিল একটি পরিচিত ঘটনা।

পাল ও সেন যুগে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন (৭৫০-১২৪৫)

সমাজ : খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে গুপ্তযুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়, ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহনের স্মৃতিগ্রন্থে, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, বল্লালচরিতে ও কুলজি গ্রন্থমালায় বর্ণ বিন্যাসের চিত্রটি পাওয়া যায়। চর্যাগীতি থেকে নিম্নবর্গের মানুষের

Scanned with CamScanner